সাহিত্যজীবনের রূপরেখা ঃ তার শঙ্কর

তারাপদ আচার্য

জীবনের পঞ্চাশ বছর বয়সসীমায় পৌঁছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮ — ১৯৭১) আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। এটি প্রথমে'শনিবারের চিঠি' নামক সেকালের বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকায় 'আমার সাহিত্য জীবন' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৩৬০ সালে (অর্থাৎ ১৯৫৩) সেটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই গ্রন্থে লেখক শুধুমাত্র তাঁর সাহিত্যজীবনী লেখেননি, এতে অনেক আটপৌরে দৈনন্দিনের কথা আছে, অনেক আত্মপ্রশংসা ও আত্মপ্রচারও আছে। অবশ্যই সেটা দোষাবহ নয়। কেননা, তাঁর মতো অতো প্রতিষ্ঠিত লেখকের দিক থেকে এসব জানতে পারার সুযোগ পেলে পাঠকরা যে উপকৃত হবেন, সে খুবই স্বাভাবিক।

এই গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেই আমাদের এই লেখার অবতারণা। তবে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর কোনো কোনো গল্প বা উপন্যাস প্রসঙ্গ এসে পড়বে মাঝে মাঝে। আমরা মনে রাখছি, যে-কোনো কথাশিল্পীর রচনার মধ্যে তাঁর নিজের জীবনের অনুষঙ্গ এসে পড়ে। এছাড়াও বিবিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একধরণের প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতার জন্যই লেখেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এই অর্থে অনেক বিদেশী ঔপন্যাসিকের মতো আমাদের শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' (সমগ্র), বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এবং তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারাশঙ্করের সমস্ত লেখা পড়লে বোঝা যায় যে, সাধারণভাবে তিনি খুব সহজ-সরল রেখায় এঁকেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের মানব-মানবীর ছবি। খুব একটা জটিল নগরজীবনের রূপরেখা, যা দেশকে ছাড়িয়ে আরো দূরের পৃথিবীকে, মানুষকে, যুগযন্ত্রণাকে এবং যুগোত্তীর্ণ মানবত্বিকে অনুসরণ করতে চায়, তারাশঙ্করের লেখার মধ্যে তার কোনো প্রকাশ নেই। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর ব্যাক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা জ্ঞানার্জন, প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলতে যা বোঝায় তার মধ্যেই তিনি আবর্তিত হয়েছেন। ফলে, অনেকক্ষেত্রে সরল এবং একমাত্রিক হয়ে উঠেছে তাঁর লেখা। কিন্তু তাতে আছে সৃজনশীল মনের আশ্চর্য ছবি ঃ

'হঠাৎ আমার ছ'বছরের কন্যা বুলু মারা গেল।

আমার সমগ্র জীবনে এই আঘাত একটা পরিবর্তন এনে দিল। জীবনের প্রবাহের মোড় ফিরে গেল। আমার জীবনে চলার পথে যে দু'নৌকোয় দু'পা রেখে চলা — তাতে ছেদ পড়ল। একখানা নৌকাকেই আশ্রয় ক'রে হাল ধরলাম। এই মর্মান্তিক আঘাত না এলে বোধহয় তা হ'ত না। এবং জীবনে এই বেদনার সুগভীর সমুদ্রে যদি না পড়তাম, তবে বেদনা রসকে উপলব্ধি করতে পারতাম না।'

এই সময় থেকেই তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন শুধুমাত্র সাহিত্যকে অবলম্বন করে আবর্তিত হতে শু করলো। রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি টেনে এভাবেই তিনি পুরোপুরি সাহিত্যনির্ভর হয়ে উঠলেন।

যে-কোনো লেখকের একটি অন্তর্জীবন এবং একটি বহির্জীবন থাকে। বহির্জীবন কোনো অর্থেই কিন্তু তুচ্ছ নয়। কেননা, সেখান থেকেই তো অভিজ্ঞতার উপাদান মিলে যায়, যা না হলে অন্তর্জীবনের ভিতর থেকে কোনোসৃষ্টিই সম্ভব নয়। তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন বলতে যা বোঝায় তা হলো রাঢ়-বঙ্গের লৌকিক জীবনের কথা। এবং সেই সঙ্গে আছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারশ্রেণীর আভিজাত্য, দম্ভ, শিল্পসঙ্গীতপ্রীতি, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে হার না-মানা। এই হার না-মানা চরিত্রগুলির যে মানবিক উপাদান, সেটাই তো সর্বকালের আধুনিক মানসতা। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তণ বয়সে তারাশঙ্করের এক আশ্চর্য ভ্রাম্যমান জীবন ছিল। ছোটো ধরণের জমিদার পরিবারের সন্তান তিনি। কিন্তু উন্নাসিক নন, সাধারণ গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করা, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া এবং তাদের জীবনের অনুপুঙ্খ জেনে নেওয়ারযে প্রবণতা, আমরা তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আলৌকিক বোধ করি। এভাবেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। তখন বৃটিশ যুগ সেজন্য রাজনীতি করা লোকদের অন্যতম ভূমিকা ছিল জনসেবা। আজকের মতো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেননি। দেশবাসীর সেবাই ছিল তাঁর আদর্শ। এজন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে। তবে এই বেরিয়ে পড়া, লোটা-কম্বল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, প্রধানত বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, — এর মধ্যেই নিহিত তাঁর ভবিষ্যতের পথরেখা, — তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সবচেয়ে বড়ো পটভূমি ঃ

'দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না। বাংলা সাহিত্যে বাউণ্ডুলে চরিত্র অনেক আছে। কাজ নেই কর্ম নেই, ঘুরে বেড়ায়, গাঁজা খায়, মদ খায় বা খায় না, মূর্খমানুষ, ঘৃণা অবজ্ঞার পাত্র; কিন্তু সকল বিপদ আপদের ক্ষেত্রে সে আছেই।শ্মশানে আছে, অভাবে আছে, দুর্ভিক্ষে আছে, মহামারীতে আছে, অন্ধকার রাত্রে ভূতভয়গ্রস্তের পাশে অভয় দিতে ব্রহ্মদৈত্যের মত আবির্ভূত হয়েছে; আমার চরিত্র তখন অনেকটা ঐ রকম। মদ গাঁজাটা খাই না — কিন্তু তারও চেয়ে কোনো তীব্রতার নেশায় মেতে থাকি, ঘুরে বেড়াই। বন্যাটা আমাদের দেশে হয় না এমন নয়, তবে কম। আগুন, ঝড় এবং কলেরা এই তিনটাই আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪/২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্ততঃ আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছ'মাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপ পুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার 'ধাত্রী দেবতা'র মধ্যে আছে।'

জীবনের এই অভিজ্ঞতা কাজে আসছে। যখন বুঝতে পারছিলেন না যে, কোন পথে তিনি চলবেন, রাজনীতি না সাহিত্যে, তখন অনেকটা ঘোরের মধ্যে কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে থাকতে থাকতে তাঁর মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল, যদিও গান্ধীবাদী রাজনীতির পথ ছিল তাঁর পথ, তবুও তিনি নিজেরই অজ্ঞাতসারে বুঝতে পারছিলেন তাঁকে সরে আসতে হবে ও-পথ থেকে। মূলত লেখালেখির পথই তাঁর পথ, তাঁর জীবনের ভবিতব্য। সেজন্য তিনি ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠছিলেন এই

ভাবনায় যে, লেখক হিসেবেই তাঁকেদাঁড়াতে হবে। একটি আশ্চর্য কঠিন-কঠোর মানসতা ছিল তাঁর, সাধনা ছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প যখন অনুমোদিত ও প্রশংসিতহচ্ছিল, তখন তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর নিজস্ব পথে চলা শু হলো। তাছাড়া আদর্শগত একটা বিশ্বাস ও চরিত্রশক্তি তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। বিশেষত কন্যা বুলু-র মৃত্যুর পর তিনি লিখলেন 'বাণী মা' গল্প। এই গল্পের বিশ্লেষণধর্মী ভাবনার মধ্যে তারাশঙ্কর তাঁর ভিতরকার বড়ো-আমি-কে যেন আশ্চর্যভাবে জাগিয়ে তুলেছেন বলে মনে হয়ঃ

'বাণীর আগে একটি মেয়ে ছিল। কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়াছিলাম বুলবুল। বুলবুল সংক্ষিপ্ত হইয়া শেষে বুলুতেপরিণত হইয়াছিল। সেই বুলু অকস্মাৎ একদিন চলিয়া গেল। প্রথমটা সে আঘাতে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। এখন মধ্যে মধ্যে ভাবি, অদ্ভুত অপূর্ব সে আঘাত। মানুষে যে কতখানি ভালোবাসিতে পারে, শোকের নির্মম আঘাত না পাইলে সে উপলব্ধি মানুষ করিতে পারে না। নারিকেলের ছোবড়া ও খোলের মত হৃদয়ের আবরণটা না ভাঙিলে অন্তস্তলের শস্য পানীয়ের অমৃত স্বাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু শোক চিরদিন থাকে না। চিরদিন কেন, বোধ করি, যে সুখকে মানুষ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া আক্ষেপ করে, তার চেয়েও স্বল্পক্ষণ স্থায়ী।শোক আস্বাদে অতি তীব্র অপূর্ব, তার প্রভাব অতি-অতি পবিত্র। শোক মানুষকে উদার করে হীনতার উর্ধলোকে লইয়া যায়, সে শোক অল্পক্ষণ স্থায়ী।'

এই যে প্রতীত এবং এই যে দার্শনিক প্রজ্ঞালোক উন্মোচিত হয়ে উঠে এখানে, তা একজন যথার্থ লেখকের চরিত্র। লেখাই তাঁর জীবনধর্ম।

এর পরও, রাজনীতি থেকে সরে আসার পরও তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমান জীবন কাটিয়েছেন। নানা জায়গায় ঘুরেছেন, নানা মানুষের সাহচর্যে এসেছেন। তাঁরা খুব শিক্ষিত না হলেও তাঁরা যে প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী, অতি স্বাভাবিক। তারাশঙ্করকে বহু বহু দূর দেশে যেতে হয়নি। তাঁর বাসস্থানের নিকটবর্তী গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মানুষ দেখেছেন, পেয়েছেন তাদের ভালোবাসা, দেখেছেন তাদের শঠতা-কাপুষতা, তাঁদের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য মন। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এর ভিতরে মিলেছেঅন্যতম আরেক মানব জীবনধারা। এইতুচ্ছ অতি সাধারণ মানুষের ভিতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে সব মহৎ মানবপ্রাণ। তাদের ঔদার্য একেবারে আকাশছোঁয়াঃ

'পাথরের দেবমূর্তি' ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপ-পূণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি।'

২.

এই যে ঘুরে বেড়ানো, গ্রামে গ্রামে মেলায়, নানা উৎসবে অনুষ্ঠানে এবং বৈষ্ণবদের আখড়ায় অথবা যাত্রাপালা, ঝুমুর, কবিগান — এসবের মধ্যে যে লোকজীবনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, লেখক তারই মধ্যে নিমজ্জিত থেকে আশ্চর্য সব জীবনরস আস্বাদন করেছেন এবং আহরণ করেছেন আবহমান মানবসম্পর্কের অনেক মণি-মানিক্য-হীরে-জহরতঃ

'দিন কয়েক পরেই এলাম একটি নিবিড় পল্লীগ্রামে। আমাদেরই মহলে। যেখানে বাসা হ'ল, তার সামনে একটি ছায়ানিবিড় আখড়া, বৈষ্ণবের কুঞ্জ। গ্রামের লোক বলে কমলিনীর আখড়া, রসিকজনে রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ! বৈষ্ণব নাই, আছে শুধু কমলিনী বৈষ্ণবী। আমি পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরই ক্ষারে ধোয়া কাপড়খানি পরিপাটী ক'রে পরে শ্যামবর্ণ মেয়েটি হাস্যমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে একখানি ঝকঝকে মাজা রেকাবীতে দু'খিলি পান, পাশে দুটি লবঙ্গ, টুকরো-কয়েক দাচিনি, একটি ছোট এলাজ, নামিয়ে দিয়ে হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে — বললে, প্রভুর জয় হোক।'

এইসব অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে 'রসকলি' এবং 'রাইকমল' নামক আশ্চর্য সব রচনা। বৈষ্ণবীয় আখড়ার মতো লেখক ঘুরেছেন বেদের দলের জমায়েত বা অস্থায়ী তাঁবুতে, তাঁর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে এবং কিছু গল্পে তার অনুষঙ্গ ছড়িয়ে আছে। লোকজীবনের কথা তিনি বলেছেন 'কবি' উপন্যাসে। এই কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত। তাদের বাস্তব প্রেক্ষাপট এতোই প্রবল ও যুগান্তকারী যে, তাতে বোঝা যায় লেখকের ভ্রাম্যমান জীবনের অভিজ্ঞতা কতোটা অকৃত্রিম। তারাশঙ্করের আরেকখানি মহৎ উপন্যাসের নাম 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। হাঁসুলী বাঁকের কাহার বাউরীদের বাস্তব জীবনচ্ছবি এই লেখা। এইসব অবহেলিত অন্তজশ্রেণীর মানুষদের কী নিবিড় ভাবেই না অনুধাবন করেছেন লেখক। এ সম্পর্কে 'আমার সাহিত্য জীবন' নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেনঃ

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র মানুষদের পর্যন্ত আমার এইভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। বাড়িতে যখন থাকতাম, এখনও যখন যাই লাভপুরে তখন সকালবেলা উঠেই বাড়ি থেকে বের হই, আমার 'কবি' উপন্যাসের বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই। তাদের সঙ্গে গল্প করি। যোগেশ বৈরাগী ওখানকার দুর্ধর্ষ ব্যাক্তি, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। নিতাই বাউড়ী, সতীশ ডোম এরা এসে মাটিতে উপু হয়ে বসে গল্প শোনে। রাজা পয়েন্টসম্যান এসে সেলাম করে দাঁড়ায়, সেলাম হুজুর। জায়গাটা খাঁ খাঁ করে বিপ্রপদ অর্থাৎ দ্বিজপদর জন্যে। সে নেই। পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে, নাকছাবি পরে দাঁড়ায়, বলে — হেই মা গো। কখন এলা? বলি মনে পড়ল আসতে। ছেলেরা ভাল আছে? তোমার শরীর এমন হল ক্যানে?'

জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করার এই পটভূমি — এতে কোনো ফাঁকি নেই। ফলে তারাশঙ্করের সাহিত্যিকীর্তির মধ্যাপর্ব পর্যন্ত যেসব মানবমানবীর সঙ্গে পাঠকের দেখা মেলে তাদের সবার বিষয়ে লেখক যেন অবলীলায় বলে দিতে পারেন এই রকম সব কথা ঃ 'আমার কবি' উপন্যাসের বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই।' ফলে, এই মানুষরা যেন তাঁর ভিতরে চলে আসে একেবারে। অবশ্যই তা আসে। যাদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করেন, পরিচিত হন, পরম আত্মীয়তার সম্পর্কে বাঁধা পড়েন, তারা সবাই তো তাঁকে নসুবালার মতো করে কুশল জিজ্ঞাসা করে ঃ হেই মা গো। কখন এলা? বলি মনে পড়ল আসতে। ছেলেরা ভালো আছে? তোমার শরীর এমন কাহিল হল ক্যানে? শুধু তাই নয়, এই বাস্তব পরিবেশের মানবমানবীরা তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ করে অনেকটা ভিন্নতর হয়ে যায়। প্রকৃতিজগতের সম্পূর্ণ কাঁচামাল তো আর সাহিত্য হতে পারে না। তার সঙ্গে এসে মেশে লেখকের মনের কল্পনা-মণীষা। এ সম্পর্কে গভীর তত্ত্বকথা খুব সহজ করে বলেছেন তারাশঙ্কর। বলেছেন আপন প্রজ্ঞালোক থেকে ঃ

'আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে ফুটল।

শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না — আমার মনে হ'ল, আমি কেমন করে অচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম। যার স্পর্শে ঘুমন্ত অসাড় মানুষ ঘুম ভেঙে ফুটে ওঠে ফুলের মত। গল্প লেখার ওটাই একটা বড় সমস্যা। সবই হয় কিন্তু বেঁচে ওঠে না — জেগে ওঠে না। জানি না, পৃথিবীর যাঁরা মহারথী — তাঁদের কেউ এই বাঁচিয়ে তোলার, জাগিয়ে তোলার বিদ্যাই বলুন — আর মন্ত্রই বলুন — এটা কার কাছ থেকে শিখেছেন কি না — অথবা শাস্ত্র পড়ে পেয়েছেন কি না। তবে আমার মনে হয় — ওই শক্তিটুকু একদিন অকস্মাৎ জেগে ওঠে। কেমন ক'রে জানি না — শিল্পী সাহিত্যিকের আসে একটা তন্ময়তার যোগ; তখন পাত্র-পাত্রীর জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে ডুবে যায় শিল্পী; তখনই জেগে ওঠে — ফুটে ওঠে। এইটুকু আমার সম্বল।'

লেখক এই যে সম্বলের কথা বলেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে, তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সমস্ত লেখাটির মধ্যে প্রাণ করার শক্তি — সে খুবই দুর্লভ, আর সেজন্যই একে বলে প্রতিভা। প্রতিভাহীন অগণিত কবি-সাহিত্যিক আছেন পৃথিবীতে, তাঁরা অনেক লিখেছেন, কিন্তু কি এমন এসে যায় তাতে? সে সব লেখা তো একদিন হারিয়ে যায়, কেউ মনে রাখে না। অথচ, সেই আদিকাল নাম-না-জানা শিল্পীর গুহাচিত্র অথবা ভগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত ভাস্কর্য, সেসবের সংগ্রহ আমাদের অভিভূত করে। কেননা, তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের প্রাণিত করে, জীবনকে শত-সহস্রধারায় উন্মোচিত করে দেয় — আমরা জীবনের একটা অন্যতর মানে

পেয়ে যাই। এই অর্থে, গ্রীক্ নাটক, ঋগ্বেদের কিছু সূক্ত, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ — এঁদের লেখায় আছে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ফলে, সে লেখা বা সে শিল্প কোনোদিন মরে না। এই যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা শক্তি, এ কেউ শাস্ত্রপাঠ বা জ্ঞানার্জনের সাহায্যে লাভ করেন না। এ শক্তি সহজাত। তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, জ্ঞানার্জনের সাহায্যে এ শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশে সহায়তা মেলে।

৩.

অবশ্যই তারাশঙ্করের লেখায় এ শক্তির অনেক প্রমাণ আছে। তাঁর সমস্ত লেখাতে যদি এই 'প্রাণশক্তি' অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে ভুল হবে। তাঁর অজস্র সাধারণমানের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে প্রবল ও ভাস্বর হয়ে থাকে 'রাইকমল', 'ধাত্রীদেবতা', 'কবি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' প্রভৃতি। আর গল্প বলতে যেসব যুগান্তকারী লেখাগুলির কথা মনে আসে, তা হলো 'রাইকমল', 'মালাচন্দন', তারপর 'জলসাঘর', 'যাদুকরী', 'তারিণী মাঝি' ও 'অগ্রদানী'। উল্লেখ থাকা ভালো যে 'রাইকমল' প্রথম গল্পাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'রাইকমল' ও 'মালাচন্দন' মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'রাইকমল' উপন্যাসে।

'গণদেবতা' (১৯৪০) উপন্যাসে তারাশঙ্করের শুনতে পেয়েছিলেন অনাগত নতুন যুগের পদধ্বনি। বাঙলার গ্রাম-সমাজের প্রচলিত কাঠামো যে ভেঙে পড়ছে এবং সেখানে নির্মিত হচ্ছে গণজীবনের নতুন ইমারত, সেকথা লেখকের ভ্রাম্যমান জীবনের প্রেক্ষাপটে ধরা পড়েছিল। এই অর্থে 'গণদেবতা' যুগপরিবর্তনের উপন্যাস। রূপান্তরের রেখাচিত্রটি তারাশঙ্কর যে ভাবে এঁকেছেন ঃ

(১) 'নাপিত বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার সবাই আমাদের (গিরিশ-অনিদ্ধের মতো গ্রামের মানুষদের) ধুয়ো নিয়ে ধুয়ো ধরেছে — ওই অল্প ধান দিয়ে আমরা কাজ করতে পারব না। তারা নাপিত তো আজই বাড়ির দোরে অর্জুনতলায় খান কয়েক ইট পেতে রয়েছে, বলে, 'পয়সা আন, এনে কামিয়ে যাও—'

'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে একটি গাছ কাটার ঘটনা। বিক্রী করে দেবে বলে রহম শেখ একটি তালগাছ কেটেছিল।

(২) 'গাছটা তাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ। তার দাদু গাছটা লাগাইয়া গিয়াছিল। এ গাছ বেচিবার কল্পনাও কোনোদিন রহমের ছিল না। কিন্তু এবার সে বড় কঠিন ঠেকিয়াছিল। একটা কথা কিন্তু রহমের মনে হয় নাই। সেটাই আসল কথা। তিন পুষের মধ্যে ওই গাছটার স্বামীত্বের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কথাটা তাহার মনেও হয় নাই। তাহার বাপ শেষ বয়সে ঋণের দায়ে ওই জমি বেচিয়া গিয়াছে কঙ্কনার মুখুয্যেবাবুকে। রহমের বাপ জমি বিক্রী করিবার পর বাবুর কাছে জমিটা ভাগে চষিবার জন্য চাহিয়া লইয়াছিল। তাহার বাপ জমি চষিয়া গিয়াছে — রহমও চষিতেছে। কোনোদিন একবারের জন্য তাহাদের মনে হয় নাই, জমিটা তাহাদের নয়।'

যে-কোনো সৃষ্টিশীল মন এভাবেই দেখতে পায় যুগের পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই ব্যাপারটি 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসেও আছে। গ্রামের নিচুশ্রেণীর দরিদ্র চাষী অথবা ক্ষেতমজুরকে তথাকথিত ভদ্রলোকেরা তুই-তুকারী করে কথা বলেন। করালী কাহার-এর প্রতিবাদ করেছিল, যেমন প্রতিবাদ করেছিল 'গণদেবতা' উপন্যাসের দেবু ঘোষ। সে-ও কানুনগো-কে তুই-তুকারীর জবাবে তুই-তুকারী করেছিল।

এই ধরণের পরিবর্তনের ইঙ্গিত আরো আছে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে অথবা 'জলসাঘর' গল্পে। এখানে শিবনাথ এবং বিশ্বম্ভর ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ। তাঁরা ব্যবসাবৃত্তির কাছে মাথা হেঁট না করলেও সামন্ত-অভিজাত্যের যে অবসান ঘনিয়ে আসছে, সে খুব প্রবলভাবেই বুঝেছিলেন তারাশঙ্কর। শিবনাথ চরিত্রের মধ্যে লেখকের ব্যক্তি-জীবনের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করা যায়। আর বিশ্বম্ভর তাঁর দেখা বা জানা কোনো সামন্ত-প্রতিভূ।

এই প্রসঙ্গে পৌঁছবার পূর্বে আমরা লেখকের একটি যুগান্তকারী উপন্যাসের কথা বলে নিতে পারি। উপন্যাসটির নাম 'কবি'। এখানে একটি প্রেমের ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব আছে। তার একদিকে ব'ন, অপরদিকে ঠাকুরঝি, আর, মাঝখানে নিতাই কবিয়াল। এই লেখায় তিনি যথার্থ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতায় অমৃতফল বলতে যেগুলিকে বোঝায় 'কবি' উপন্যাসটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

এখানে বাস্তব জীবনসত্যে বিধৃত মানবমানবীরা যেন প্রাণ পেয়ে সজীব ও সচল হয়ে আছে। অবশ্য 'কবির' মতো 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' সম্পর্কেও একথা সত্য।

৪.

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের শিবনাথ চরিত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষত তারাশঙ্কর নিজেই আছেন। তাঁর জীবনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসগুলির সম্পূর্ণ অবয়ব এখানে ধরা পড়েছে মনে হয়। এই উপন্যাস এবং 'জলসাঘর' গল্প একেবারেই প্রতীকধর্মী রচনা। সামন্তদের জীবনের যে মহৎ দিকটি এইসব লেখায় প্রতিফলিত, সেসব চরিত্রের মানুষের সংখ্যা খুবই বিরল ছিল। কেননা, সামন্তপ্রভুরাতো প্রজা সাধারণের ওপর অত্যাচার করেছেন এবং শোষণ করেছেন। এর থেকেই এসেছে গণ-অভ্যুত্থান। পৃথিবীর সবদেশেই এটি নির্মম ঐতিহাসিক সত্য। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের সুখে-দুঃখে সহায়তা দান, জমিদার ও সাধারণ প্রজার মধ্যে কোনোরকম ভেদরেখা বজায় না রাখা প্রভৃতি ব্যাপারগুলো নিয়ে তাঁর যে ব্যক্তিজীবন, সেটা একেবারে সামন্তপ্রভুদের উল্টোপিঠ। একারণেই তিনি জমিদার হয়েও শোষণ ও শাসন-বিমুখ এক মুসাফির মানুষ। তাঁর ঔদার্য ও মানবপ্রীতির নিদর্শন ঃ

'মেয়েটি চলিয়া গেল; তাহার পদক্ষেপের মধ্যেও সমতা নাই, পায়ে পায়ে টোক্কর খাইতে খাইতে সে চলিয়াছে। শিবনাথ সহসা ক্ষণপূর্বের মনোভাবের জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িল, নিজের কাছেই নিজে অপরাধ বোধ করিল। তাহার মনে হইল, লক্ষ লক্ষ যুগের ক্ষুধা ওই মেয়েটির উদরে জ্বলিতেছে। সে ক্ষুধার অন্ন তাহারাই পুষানুক্রমে কাড়িয়া খাইয়া আসিয়াছে, সে নিজেও খাইয়াছে।'

দুর্ভিক্ষপীড়িত একটি ক্ষুধাতুর মেয়ের প্রসঙ্গে এই ভাবনা — ঠিক যথার্থ মানবিকতাবোধ সম্পন্ন মহৎ মানুষের ভাবনা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে যিনি ভাবছেন, তিনি একজন ছোটো আকারের সামন্তপ্রভু। এরপর আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে যাব। এই পাঠ অভিজ্ঞতায় উপনীত হলে আমাদের মার্ক্সীয় তত্ত্বের কচকচানি থেমে যায়। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে একজন সামন্তও কী অসাধারণ মহত্বে নিজেকে উত্তীর্ণ করে নিতে পারেন!

'অন্দর হইতে বাহির হইয়া একটা বড় রাস্তা-ঘর অতিক্রম করিতে হয়, শিবনাথকে সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। দরজার মুখেই কতকগুলি বোরকা-পরা মেয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মর্যাদাশালী মুসলমান ঘরের স্ত্রীলোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানকার সাধারণ চাষী-মুসলমানদের মেয়েরা তো বোরকা পরিয়া বাহির হয় না; কিন্তু এই ভয়ঙ্কর দ্বিপ্রহরে ইঁহারা কোথায় আসিয়াছেন, এখানেই বা দাঁড়াইয়া আছেন কেন? শিবনাথ ফিরিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবে অথবা নিত্যকে ডাকিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় একটি মহিলা বোরকার একাংশ মোচন করিয়া বলিল, বাপ!

শিবনাথ সসম্ভ্রমে বলিল, মা, আমাকে বলছেন? এই দুপুরে আপনারা কোথায় এসেছেন?

বৃদ্ধা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, এ ধূপের চেয়েও জ্বালায় জ্বলছি যে বেটা; আর এ সময় ভিন্ন পথঘাট দিয়ে চলবারও যে জো নাই! — বলিয়া একটি পোঁটলা খুলিয়া কতকগুলি রূপার অলঙ্কার ও খানকয়েক সেকেলে জীর্ণ শাল বাহির করিয়া বলিল, জান বাঁচাও বেটা, খোদা তোমার মঙ্গল করবেন। কচি বাচ্চারা না খেয়ে মরে যাবে বেটা, আর আমাদের দুশমানও বাগ মানছে না, পেট জ্বলে খাক হয়ে গেল বাপ। এ রেখে কিছু টাকা — দশটা টাকা আমাকে দাও বেটা।

শিবনাথ স্তম্ভিত হইয়া গেল, চোখে তাহার আসিতেছিল।' মানুষের প্রতি এই যে মর্যাদা জ্ঞাপন, এর একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে এবং স্বতন্ত্র শিক্ষা আছে। লেখক কোথা থেকে এতো বড়ো মানবিকতার শিক্ষা পেয়েছিলেন তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে অনুমান করা যায়, এ তাঁর সহজাত অভিজ্ঞান। এমনও হতে পারে যে,

পূর্বপুষের রক্তধারার সঙ্গে তাঁর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এই শিক্ষা — এই মহাপ্রাণতা! সাধারণ মানুষের দিক থেকে এর প্রতিদানও পেয়েছেন তিনি ঃ 'এ ছাড়া এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি গ্রামে গ্রামান্তর মেলায় ঘুরেছি অনেক। এদের অতিথি হয়েছি, পরিচর্যায় পরিতৃপ্ত হয়েছি। এমনও হয়েছে, গরমের দিন, মশার উপদ্রব, সঙ্গে মশারি নাই — তাদেরও মশারির অভাব, যা আছে তাও বের করতে লজ্জা পেয়েছে — সুতরাং বিনা মশারিতেই শুয়ে মশার কামড়ে অস্থির হয়েছি — এমন সময় পাখার হাওয়া গায়ে লেগেছে। গৃহস্বামী নিজে কখন উঠে এসে বাতাস করতে শু করেছেন। অথচ গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিশিষ্ট লোকে যখন জিজ্ঞাসা করেছেন, উঠেছেন কোথায় ? বা উঠেছিলেন কোথায় ? — উত্তরে যখন গৃহস্বামীর নাম করেছি তখন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, উঠবার আর জায়গা পেলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি যে, এতবড় কুটিল মামলাবাজ কুচক্রী আর দ্বিতীয় নাই এ অঞ্চলে। বলেছেন, যে অন্ন পেটে গিয়েছে তা হজম হলে হয়। গ্রাম্য ভদ্র জনের সমাজে, চাষীর গ্রামে, বৈষ্ণবের আখড়ায় এমনই ভাবে তাদের জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটা বড় সুবিধা ছিল আমার। রূপ আমার ছিল না, যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে কর্কট নাগ বিষজর্জর নল রাজার সারথ্য কর্ম গ্রহণের সুযোগের মত আমিও পেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবার সুযোগ। ওদের কথাবার্তায় আচার ব্যবহার সব জেনেছিলাম সে দিন — ওদেরই একজনের মত।'

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, জীবন অভিজ্ঞতা মন্থনজাত এই অমৃতের যেখানে অভাব ঘটেছে, শেষপর্বের সেইসব লেখায় এসেছে, চমক বা গিমিক। এসেছে আকস্মিকতা। এই পর্বে, যার সূত্রপাত 'আরোগ্য নিকেতন' থেকে, এখানে তিনি বিফল হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সাফল্য তো আকাশ ছোঁয়া। একজন লেখকের জীবনের সবটাই সাধারণত সফল হতে পারে না।

৫.

তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্যজীবন'-এর এক জায়গায় বলেছেন, 'উনিশ শো তেত্রিশ সালে ওই মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেনে একখানি পাকা দেওয়াল টিনের ছাউনি ভাড়া করিলাম। সাহিত্যিক জীবনের ভূমিকা পর্ব শেষ ক'রে পুরোদস্তুর সাহিত্যিক জীবন শু হল। কল চৌবাচ্চা ছিল না, একটা টিনের গোল জালা কিনলাম, ভোরবেলা কলে জল এলেই বালতি করে রাস্তার কল থেকে জল এনে জালাটা ভর্তি করে রাখতাম। তার আগেই ঘর পরিষ্কার, জল দিয়ে মোছা শেষ হ'ত। আসবাব কিছু ছিল না, একটা দেওয়ালের তাকে সামান্য জিনিস থাকত; মেঝের উপর শতরঞ্চি পেতে, সুটকেস টেনে সেইটাকে রাইটিং ডেস্ক হিসাবে ব্যবহার করতাম। কিছুদিন পর আলিপুরের আদালতের কাছে পুরোনো আসবাবের দোকান থেকে একটা কুশন-মোড়া আধা-সোফা এবং একটা ফোল্ডিং চেয়ার কিনেছিলাম। বিকেলবেলা ফোল্ডিং চেয়ারটা বের করে বাইরে গলি-রাস্তায় পেতে বসে আরাম করতাম। বিড়ি টানতাম। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আরো বিচিত্র। ওখান থেকে রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ের মোড়ে যেতাম চা খেতে। তা সে যতবারই ইচ্ছে হোক না কেন। দুপুর রাত্রির আহারের ব্যবস্থা প্রথম মাসটা করেছিলাম — আমাদেরই দেশের কয়েকটা ছেলে মনোরঞ্জন সরকার, বাদল, সুধীর আরও দু-তিনজন ভাগ্যান্বেষণে ওইখানেই মহানির্বাণ রোড,অশ্বিনী দত্ত রোড এবং মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেনের সংযোগস্থলে কয়লার ডিপো খুলেছিল, তার সঙ্গে ছিল দুধের ব্যবসা, মুদিখানা। ওদেরই সঙ্গে মাসখানেক খাওয়া দাওয়া করেছিলাম, তারপর পাইস হোটেলে।'

এর মধ্যেই ধরা পড়েছে একটা পরিষ্কার ছবি। ব্যক্তিজীবনে কতোই-না অর্থকষ্ট সহ্য করেছেন লেখক। অথচ, তিনি এসব না করতেও পারতেন। মোটামুটি ছোটো ধরণের জমিদার বাড়ির ছেলে তিনি। অন্যান্যদের মতো ব্যবসা করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। স্ত্রীর সেরকমই পরামর্শ ছিল। আর, তিনি সে পরামর্শ অনুসরণ করছিলেন না বলে স্ত্রীর দিক থেকে অনেক গঞ্জনাও সহ্য করেছেন। দুর্ভিক্ষের দিনে চরমতম অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েও তিনি স্ত্রীর অর্থ অথবা গয়না হাত পেতে গ্রহণ করেননি। স্ত্রী দিতে চাইলেও তিনি এড়িয়ে গেছেন; এই যে তেজ বা অহঙ্কার, যাকে বলে আত্মমর্যাদাবোধ, এরই জোরে তিনি চরমতম কৃচ্ছ্র সাধন করেছেন। স্ত্রী এবংশ্বশুরবাড়ির প্ররোচনা তিনি এড়িয়ে গেছেন, কোনো বিরোধ বা ঝগড়া নয়, হাসিমুখে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছেন তিনি। মানুষ হিসেবে তিনি অনেক বড়ো মাপের ছিলেন বলে পেরেছিলেন অতোদূর পর্যন্ত কঠোর হতে। নিজেকে দরিদ্রতম অবস্থার মধ্যে নিয়ে গিয়েছেন, প্রায় সর্বহারাদের মতো জীবন কাটিয়েছেন, তথাপি মাথা নত করেননি। শিবনাথের পিসিমা যে বলতেন, 'না খাবো উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত' — এই প্রবাদ বাক্যটি যেন জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠছিল তঁার। জমিদারীর নিষ্ঠুর শোষণ ও অত্যাচারের পথে নয়, ব্যবসাদারীর নিকৃষ্ট হীনমন্যতায় নয়, একজন সাহিত্যরচয়িতার সর্বব্যাপী মহিমায় তিনি নিজেকে জাগিয়ে তুলেছেন। গভীর নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন তাঁর ইপ্সিত পথের লক্ষ্যে। এই যে তাঁর হার-না-মানা মনোভাব, এর পরিণতি ভয়ংকর হতে পারতো, তিনি সাহিত্যজীবনে বিফল হতে পারতেন, কিন্তু তাই বলে তিনি আপস করেন নি। তিনি কোনো নিশ্চিত সাফল্যের স্থূল অর্থকরী জীবনের পথে পরিচালিত করেন নি নিজেকে।

এদিক থেকে ভাবলে শিবনাথ এবং ঋিস্তর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর মিল খুবই প্রবল। একজন সত্যাশ্রয়ী মানবপ্রেমিক জমিদার শিবনাথ, দুর্ভিক্ষে বা মহামারীতে প্রজাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন, তাদেরই একজন হয়ে। নিজের ভোগসুখের জন্য নয়, প্রজাদের দুঃখমোচনের জন্য পথে নেমে আসতে পারেন। কিন্তু নিজের যেটুকু সঙ্গতি, তার মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন, হঠাৎ আভিজাত্যের দম্ভে হঠকারীর মতো কাজ করেন না, সেই শিবনাথই তারাশঙ্কর। আবার জমিদার ঋিস্তরের মতো জেদও আছে তাঁর, তবে সে জেদ কোনো বিকৃত দম্ভ অনুসারী নয়, সে তাঁর নিজের সাধনার পথে এগিয়ে চলার জেদ। সাহিত্য সাধনাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এই ব্রত পালনে বিঘ্ন ঘটবে ভেবে চাকরিও নেননি। চাকরি নয়, ব্যবসা নয়, জমিদারি নয়, — শুধুই সাহিত্য — সর্বব্যাপী এক বিদ্ধতা ভেদ করে তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীর গঞ্জনা এবংশ্বশুরবাড়ীর প্ররোচনা তিনি হাসিমুখে এড়িয়ে গেছেন। শিবনাথ অতি সাধারণমানের জমিদার। কোনো রকম আর্থিক সচ্ছলতা নেই বলে, বিরূপ-মনোভাবাপন্ন স্ত্রী এবং বিরূপ মনোভাবাপন্নশ্বশুর বাড়ির প্রতিটি মানুষ। শিবনাথের মায়ের শেষ সময়ে গৌরীকে আনতে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি আসেন নি। ফলে, শেষমুহূর্তে তাঁর সঙ্গে একবার দেখাও হলো না। শ্রাদ্ধের সময় বাপের বাড়ির লোকদের সঙ্গে গৌরী এলেন। কিন্তু এসেও তাঁদের মনের কী অদ্ভুত বিরূপতা! জমিদার শিবনাথের ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থিতি ওঁদের কাছে কী প্রবল ও ভয়ংকর তার প্রমাণ-স্বরূপ কমলেশের মনোভাব ঃ 'শিবনাথ তাহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে একটা চাকুরী দিয়া তাহার টেবিলের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া কৈফিয়ৎ লইলে কেমন হয় ? অথবা টাকা ধার দিয়া ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া নির্মম আকর্ষণে টানিলে কেমন হয় ?'

এই মনোভাবেরই প্রতিধ্বনির মতো গৌরীও শিবনাথকে কলকাতায় গিয়ে চাকরি নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, ব্যবসাও করতে পারা যায়। টাকার অভাব হবে না। কয়লার ব্যবসা করলে যতো খুশি টাকা ঋণ পাওয়া শিবনাথের পক্ষে অসম্ভব নয়। জমিদারির এইসব গ্রাম্য ঝামেলা থেকে বহুদূরে শহরে শান্তির নীড় রচনা করতে চেয়েছিলেন গৌরী। কিন্তু বাস্তবে তা যে কোনোদিনই সম্ভব নয়, সেটুকু বুঝবার ক্ষমতাও ছিল না তাঁর। কেননা, শিবনাথের সঙ্গে তো মাটির যোগসূত্র আছে। তাঁর কাছে মা ও মাটি সমান। গ্রামের সাধারণ গরিব-দুঃখী প্রজাদের জন্য সবসময় তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে থাকে। বর্ষা ঠিকমতো না হওয়ায় যখন মাঠের ধান মাঠেই বিনষ্ট হতে বসেছিল, তখন শিবনাথ তাঁর জমিদারির নিজস্ব খাস পুকুরগুলির সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে ধানচারাগুলি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। পুকুরের সব মাছ নষ্ট হয়ে গেলে যে জমিদারের অনেক ক্ষতি হবে, তা তিনি ভালোই জানতেন। কিন্তু সমস্ত কিছু ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে তিনি। তিনি ভেবেছিলেন সমস্ত পুকুরের জল

ছেড়ে দিয়ে ধানচারা বাঁচাবেন ঃ

'সমস্ত পুকুরের জল ছেড়ে দেবে নাকি?

হ্যাঁ, বলেছি। তুমি মাঠের অবস্থা দেখ নি গৌরী —

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অসহিষ্ণু গৌরী বলিল, দরকার নেই আমার দেখে। কিন্তু পুকুরের মাছ কি হবে শুনি?

অবেগময় কণ্ঠে শিবনাথ বলিল, মানুষ মরে যাবে গৌরী, ধান না হলে মানুষ মরে যাবে।

কিন্তু মাছের টাকাটা লোকসান হবে, সে কে দেবে?

লোকসান স্বীকার করতে হবে, না করে উপায় নেই। ধান না হলে দুর্ভিক্ষ হবে, আমরাও হয়তো খেতে পাব না।

বাবাঃ, তোমার ধানের চরণেও প্রণাম, তোমার জমিদারির চরণেও প্রণাম।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল, এ কথার কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু আবার তাহার মন ধীরে ধীরে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল; এইটুকু কিশোর বয়সে স্বার্থের এমন লোলুপতা দেখিয়া তাহার সমস্ত অন্তর দুঃসহ ক্ষুব্ধতায় গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল।'

কিন্তু এই যার মানসিকতা সেই গৌরীকে তিনি জয় করেছিলেন তাঁর শান্ত ও সমাহিত ব্যক্তিত্বের দ্বারা। তাঁর নির্লোভ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানসিকতা এতোটাই সারবত্তাময় ছিল যে একদিন সকলেরই মাথা হেঁট হয়ে গেল। যিনি একজন মহাপ্রাণ ও উদারচেতা মানুষ, যিনি দেশ ও মানবকল্যাণকে আপন জীবনের সবচেয়ে বড়ো ব্রত বলে মেনে নিয়েছেন এবং সেই পথে ধীর, অথচ আত্মনিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন, তাঁকে কয়লার ব্যবসায়ে, অথবা শ্বশুরবাড়ির ব্যবসায়ে প্ররোচিত করা যে একেবারেই সম্ভব নয়, সেকথা বোঝাবার মতো যোগ্যতা ছিলনা গৌরীর, অথবা, গৌরীর বাপের বাড়ির লোকদের।

তাঁরা কেউই বুঝতে পারেন না যে, দেশকে মাটিকে মা বলে ধ্যান করেন শিবনাথ, তাঁদের কারো সে মহাপ্রাণতা নেই, তার দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, দেশের দুর্গত মানব সাধারণের জন্য কাজ করার মধ্যে যে চরিত্র গরিমা আছে তার যথার্থ স্বরূপ কী হতে পারে। সেজন্যই শিবনাথের এই দেশ ও মাটির প্রতি আবেগ তাদের কাছে নিষ্ফল মনে হয় ঃ

'কার্তিকের প্রারম্ভ, শেষরাত্রে শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে, প্রভাতে শিশিরকণায় সমস্ত যেন ভিজা হইয়া থাকে। সূর্য দক্ষিণায়ণে ক্রমশ দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়াছেন, তবুও এবার রৌদ্রের প্রখরতা এখনও কমে নাই। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই রৌদ্রের মধ্যে যেন একটা জ্বালা ফুটিয়া উঠে, সে জ্বালায় শোষণে মাটির বুকের রস নিঃশেষিত হইয়া শুষ্ক হইতে চলিয়াছে। দিগন্তপ্রসারী শস্যক্ষেত্রে শস্যশীর্ষগর্ভা ধান্যশ্রী নীরস ধরণীর বুকের উপর তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় কিশোরী কন্যার মত এলাইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর বিবর্ণতা কিশোরীর সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে। মাঠজোড়া ধানগাছগুলির পাতার প্রান্তভাগ হলুদ হইয়াছে। তবুও উদগমোন্মুখ ধান্যশীর্ষের একটি ক্ষীণ হৃদ্য গন্ধে প্রান্তরটা ভরিয়া উঠিয়াছে — ধান্যময়ীর অঙ্গ-সৌরভ। আর কানে বাজিতেছে, মাঠজোড়া সোঁ-সোঁ শব্দ। তৃষ্ণায় মরণোন্মুখ কিশোরীকন্যার জন্য আপন তৃষ্ণার জন্য ধরিত্রী জল চাহিয়া কাঁদিতেছেন।'

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো মাটি। কেননা, মাটিতেই আমাদের জন্ম এবং মাটিতেই আমাদের জীবন। সেই মাটিকে ভালোবাসতে না পারলে কখনো কোনো মহৎ কাজ করা সম্ভব নয়। ব্যবসা করে টাকা উপার্জন করা যায়, অত্যাচারী জমিদার হয়ে প্রজাপীড়ন করে বেশ সুখে থাকা যায়, কিন্তু এই সহজ পথ তো আর সবার জন্য নয়। একজন শিবনাথ প্রজাদের জন্য নিজের অনেককিছু ছাড়তে পারেন। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি শুকিয়ে যাওয়া ধানজমিতে জল সেচের জন্য নিজের সবগুলো পুকুরের জল দিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছিল। সেসব তিনি হসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ব্যবসা করার মতো অর্থকরী পথ অবহেলিত হয়। দুর্গত মানবাত্মার জন্য হৃদয়বেদনা সম্পূর্ণরূপে অকৃত্রিম। তারই মানবিক ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে তারাশঙ্করের লেখায়। এখানেই তিনি মহৎ এবং এখানেই তিনি কালজয়ী।

এই হলো তারাশঙ্করের জীবন এবং এই হলো তারাশঙ্করের সাহিত্য। এই দুটি যেন মিলেমিশে এক হয়ে আছে, সেখানে তাঁর সাফল্য একেবারে আকাশছোঁয়া। তাঁর জন্মশতবর্ষে এই আমাদের অনুধ্যান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com